সত্যজিৎ-মানস ও সমকালীনতার দ্বন্দ্ব

পার্থপ্রতিম ঘোষ

> Inspite of poverty & waste, Ray is an optimist [...] and this optimism is both his greatest strength and his basic weakness. It explains Ray's own limited vision not only of the human life, but also of life as it is found in his own country. There are no Villains in this universe, no evil, no cruelty, no real violence. Possibly, it's a partial view, particularly in a country like India. It is rather like seeing his country and his people with the wrong end of a Telescope, but what he has seen & and created for us is seen by a Poet's Eye and at a time when there are so many prophets of gloom, singing a hymn to destruction and despair [...] the world need a Ray ...

ফিল্ম ওয়ার্ল্ড পত্রিকায়, শ্রীলঙ্কার চিত্র পরিচালক ও সমালোচক লেস্টার জেমস পেরিজ, এরিক রোডস কে উদ্ধৃত করে সত্যজিৎ সম্পর্কিত এই মূল্যায়নটি করছেন ১৯৭০ সালে। আমাদের মনে পড়ে যাবে — এই বছরেই, সত্যজিৎ তখন নির্মাণ করছিলেন *প্রতিদ্বন্দ্বী* ছবিটি — যেটি পরবর্তীকালে, কলকাতা ট্রিলজি পর্বের প্রথম ছবি হিসেবে চিহ্নিত হয়।

এই দুই ঘটনার সমাপতনে, যে গুরুত্বপূর্ণ তথ্যটি আমাদের আলোচনায় প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে, সেটি হল — সত্যজিৎ তখন *প্রতিদ্বন্দ্বী* ছবিটি নির্মাণ করছেন বা করবার প্রণোদনা পাচ্ছেন, পেরিজের ওই মূল্যায়নের প্রায় বিপরীত বিন্দুতে দাঁড়িয়ে। সত্যজিতের চলচ্চিত্রকর্মে এই প্রথম লক্ষ্য করা যাচ্ছে সত্তরের কলকাতার অশান্ত হৃদ্‌স্পন্দন। এক অশুভের স্পর্শ। এর পর থেকে তাঁর ছবিতে ক্রমশঃই দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হয়েছে এক অনপনেয় বিষণ্ণতার কালো ছায়া, যার মহত্তম প্রকাশ পাওয়া যাবে ১৯৭৫ সালে নির্মিত *জন অরণ্য* ছবিতে — যেটি, কলকাতা ট্রিলজি পর্বের শেষ ছবি।

পেরিজের বক্তব্যের সূত্র ধরে যদি তাকাই সত্যজিতের সমগ্র চলচ্চিত্রকর্মের দিকে, তাহলে দেখতে পাব — বিষয়, গুণ আর শৈলীগত এক স্পষ্ট বিভাজন রেখায় চিহ্নিত হয়ে আছে তাঁর চলচ্চিত্রজীবন। এর সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে আছে *অরণ্যের দিনরাত্রি* ছবিটি। এই ছবি থেকেই যেন অনুভূত হচ্ছে — সত্যজিৎ মানসেও এসে পড়ছে সমকালীনতার চাপ। একজন সংবেদনশীল শিল্পী হিসেবে, তখন থেকেই তিনি যেন বাধ্য হচ্ছেন — পিরিয়ড পিস ছেড়ে সমকালীন বিষয়ের দিকে তাকাতে। এ যেন তাঁর চেনা পৃথিবী নয় আর। এ পৃথিবী ক্রমশঃ বদলে যাচ্ছে তাঁর আশৈশব লালিত অপাপবিদ্ধ জগৎ থেকে।

আসলে, পেরিজ যে জগতের প্রতিফলন দেখেছিলেন সত্যজিতের ছবিতে, সেই জগতের এক স্বাভাবিক উত্তরাধিকার প্রবাহিত হয়েছিল সত্যজিৎ-মানসেই। তাঁর শৈশব ও যৌবন কেটেছিল এক পিউরিটান ব্রাহ্ম পরিবেশে। এই ব্রাহ্ম কমিউনিটির জন্ম ভারত তথা বাংলার এক বিশেষ ঐতিহাসিক সন্ধিক্ষণে। এ সেই সন্ধিক্ষণ — যার জন্ম দিয়েছিল মূলতঃ এক পশ্চিমী আলোকপর্ব — এক নবজাগৃতির। অর্থাৎ, রবীন্দ্রনাথ আর সত্যজিতের উত্থান মূলতঃ একই জমি থেকে। বলা যেতে পারে — সত্যজিৎ যেন চলচ্চিত্রমাধ্যমে, রবীন্দ্রনাথের 'ম্যান্টল'টি

বহন করে চলেছিলেন। কী-কী গুণ বা চিহ্নে চিহ্নিত ছিল নবজাগরিত বাঙালি? চিহ্নগুলি হল উদার মানবিক দৃষ্টি, র‍্যাশনালিস্ট মানসভঙ্গী, বিজ্ঞানমনস্কতা, শরীরচর্চা, পঠন-পাঠনের প্রতি অবিচল শ্রদ্ধা, আপন কাজের প্রতি দায়বদ্ধতা এবং বিভিন্ন বিষয়ের প্রতি আগ্রহ। সত্যজিতের এবং বৃহৎ রায়চৌধুরী পরিবারের অন্যান্য সৃষ্টিশীল মানুষদের বিবিধ লেখায় আমরা দেখেছি, ঠাকুর পরিবারের মতোই রায়চৌধুরী পরিবারটিও হয়ে উঠেছিল বহুমুখী, সৃষ্টিশীল। সাহিত্য, ক্রীড়া আর প্রযুক্তিচর্চার একটি পারিবারিক কেন্দ্রস্থল। তাঁর শৈশব লালনের এই ইতিহাসটুকু সকলেই জানেন। আর, এরই পাশাপাশি, তিনি ক্রমশঃ নিমজ্জিত হয়ে গিয়েছিলেন পাশ্চাত্য ধ্রুপদী সঙ্গীতের মধ্যে। চোরাবাজার থেকে বহু তিতিক্ষায় কীভাবে গড়ে উঠছিল তাঁর রেকর্ডের ঈর্ষণীয় সম্ভার, এবং *পথের পাঁচালী* নির্মাণপর্বে কীভাবে বেচে দিলেন সেই সম্ভার, একটু একটু করে — সে কাহিনীও এখন বহুল পরিচিত। এটা এমন একটা সময়, যখন বাইরের পৃথিবী ছিল অস্থির — এখানে স্বাধীনতাসংগ্রামের শেষ পর্ব, দেশভাগের বিয়োগান্ত পরিণতিতে রণ-রক্ত-ময়। এই যে, এমন একটি অন্তর্মুখী পদ্ধতির মধ্য দিয়ে নির্মাণ হচ্ছিল সত্যজিৎ-মানসের, সেখানে বাইরের এই দ্বন্দ্ব-দীর্ণ পৃথিবীর সরাসরি কোনও ছায়াপাত ঘটছিল না তাঁর মনে ও মননে। পরিবর্তে, তাঁর চেতনায় গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছিল একটা 'বিস্ময়ের বোধ'। এই বিস্ময় থেকেই 'দেখা' বা Gazing তাঁর কাছে একটা দর্শনের মত হয়ে উঠেছিল। Leave every thing at its place, and gaze with wonder! — এই ছিল সেই দর্শনের মূল কথা। এখানে এসে মিশে যাচ্ছিল — কঠোপনিষদের দর্শন, পশ্চিমী আলোকপর্বের সঙ্গে। ১৯৫৭ সালে, *পথের পাঁচালী* নির্মাণ প্রসঙ্গে তাঁর ছবির উদ্দেশ্যের কথা তিনি বলছেন:

> to observe and probe, to catch the revealing details, the telling gestures, the particular turns of speech... the more you probed, the more was revealed, ...

আর, এর পরেই সত্যাজিত-মানসিকতাকে চিনিয়ে দেয় যে উক্তি:

and familiarity bred not contempt but love, understanding, tolerance....

এই কারণেই, সত্যজিতের চলচ্চিত্রজীবনের প্রথম পর্বে আমরা বারবার দেখেছি এক রাবীন্দ্রিক উদার-মানবতাবাদের উজ্জ্বল প্রকাশ। এই সময়কাল বিধৃত হয়ে আছে — ১৯৫৫ থেকে ১৯৬৮ পর্যন্ত। শুরুতে রয়েছে *পথের পাঁচালী* আর শেষে — *গুপি গাইন, বাঘা বাইন*। আজ নতুন করে তাঁর বিপুল সৃষ্টিভান্ডারের দিকে তাকালে মনে হবে — এই পর্বের ছবিতেই সত্যজিৎ সর্বাধিক স্বচ্ছন্দ, অনায়াস এবং বহুমুখী প্রতিভার বিচ্ছুরণে অনন্য। উনিশ শতকীয় মানবতাবাদের এই উত্তরাধিকার, এই বিশেষ দৃষ্টি, একদিকে যেমন প্রকাশিত হয়েছে তাঁর শক্তি ও প্রতিভার বিচ্ছুরণ হিসেবে এই পর্বে, অন্যদিকে সেটাই কি আবার তাঁর দুর্বলতারও কারণ হয়ে উঠল —সমকালের সমাজচিহ্নগুলি পাঠের ক্ষেত্রে? ঠিক যেমন পেরিজ বলেছেন? সংবেদনশীল একজন শিল্পী হিসেবে, পরবর্তীকালে যখন তিনি বেছে নিচ্ছেন সমকালীন বিষয় ও প্রকাশভঙ্গী, বিষয়ের সঙ্গে তাঁর মানস-জগতের একটা দূরায়ণ ঘটে যাচ্ছিল কি তাঁর? একটা প্রতিসরণ বা ডিসপ্লেসমেন্ট? যা, একজন শিল্পীর রচনা জনিত নিস্পৃহতার দূরায়ণ নয় ঠিক? আর এই দূরায়ণ কি বদলে দিচ্ছিল তাঁর সিনেমার আখ্যান-বিন্যাসই নয় শুধু, ছায়া ফেলছিল কি তাঁর ছবির অবয়বে ও? তাঁর সিনেমার নির্মানে বা শৈলীতে? আলোর ব্যবহারের মধ্যে ঘটে যাচ্ছিল কোনও গুণগত পরিবর্তন?

এ-কথাও আমাদের মনে হবে যে, উনিশ শতকের নবজাগরিত বাঙালির বিপুল উত্থান ও সমাজ সংস্কৃতিতে সেই নবজাগরণের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা থাকলেও, বঙ্গ-সমাজের মূল জীবনস্রোত থেকে তা ছিল অনেকখানি বিচ্ছিন্ন। এই নবজাগরণ ছিল পাশ্চাত্য আলোকপ্রাপ্তির ফসল। এক বিমূর্ত আইডিয়ালিজম এবং বুদ্ধির চর্চা হয়ে উঠেছিল এই জাগরণের উৎসমুখ।

নবজাগরিত বাঙালির এই শক্তি এবং দুর্বলতা চমৎকার ধরা পড়েছে সত্যজিতের ভূপতি চরিত্রে (*চারুলতা*)। আমাদের মনে হবে — একই প্রবণতা সঞ্চারিত হয়েছিল সত্যজিৎ-মানসেও। সমকালীন জীবনপ্রবাহের আর্থ-সামাজিক জটিলতায় যেহেতু তাঁর মনের স্বাভাবিক আশ্রয় ছিল না, তাই আমরা দেখব — প্রথম দশ বছরের ছবিতে তিনি প্রধানতঃ অতীতচারী অথবা ফ্যান্টাসি-নির্ভর হয়েছেন। এই পর্বের চলচ্চিত্রে বিষয় ও চরিত্রের সঙ্গে আইডেন্টিফিকেশন-এর ক্ষেত্রে তিনি সবচেয়ে স্বাভাবিক, অন্তরঙ্গ এবং উষ্ণ। চিত্রভাষার ক্ষেত্রেও দেখা যাবে যে, তাঁর প্রথম পর্বের চলচ্চিত্রের বিন্যাস, ক্যামেরা-দৃষ্টি, দৃশ্যবিভাজন, এবং আলোকসম্পাতের মধ্যে জড়িয়ে আছে এক অমলিন মমত্বের বোধ, এক চেকভিয়ান মার্জনা, দুর্মর আশাবাদ এবং অবশ্যই এক উদার মানবতাবাদী দৃষ্টি। এই পর্বের সিনেমাতে, তিনি মূলতঃ যে কার্তেসীয় আলোকসম্পাতের রীতি ব্যবহার করেছিলেন, তার মূল উদ্দেশ্য ছিল — ছবির বিবিধ ফ্রেমের মধ্যে, তার বস্তুরাজির মধ্যে একটি দ্যুতি আনা। এই আলোক-সম্পাতের কুশলতায় এবং অভিনয়ের ভঙ্গীতে, আমরা এই পর্বের প্রায় প্রতিটি ছবির মুখ্যচরিত্রগুলির চোখে একটি জ্যোতি লক্ষ করি। বিচিত্র, বাঙ্‌ময় এক উজ্জ্বল আভা- ও আশাময় মুখ-চোখই হয়ে ওঠে এই পর্বের সত্যজিৎ-সিনেমার অন্যতম প্রধান চিত্রভাষা। মৌলিক ভরবিন্দু। এর শুরু — *পথের পাঁচালী* ছবির সেই ছোট দুর্গার আবির্ভাব থেকেই — যেখানে একটি কচি পাতার পাশে আমরা প্রথম ভালভাবে দেখতে পাই দুর্গার আলোকোজ্জ্বল মুখটি। এই উজ্জ্বল আভা লেগে থাকে সর্বজয়া, অপু বা হরিহরের চোখেও। ব্যতিক্রম হয়ে থাকেন কেবল ইন্দির ঠাকরুণ। মনে করতে পারি *অপরাজিত* ছবির সেই সব অবিস্মরণীয় টু শট গুলির কথা যেখানে পর্দা জুড়ে জেগে থাকে শুধু কিশোর অপুর আর সর্বজয়ার আলোকোজ্জ্বল মুখ এবং চোখ। স্বপ্ন জেগে থাকে সেই চোখে। বা, ধরা যাক *অপুর সংসার* ছবির সেই দৃশ্যটি যেখানে অপর্ণা দেশলাই

জ্বালিয়ে অপুর মুখে ধরা সিগারেটটির কাছে হাত বাড়িয়ে দিয়ে উচ্চারণ করে— ‘‘কাজল’’। *পোস্টমাস্টার* ছবিতে — জ্বরে বেহুঁস নন্দবাবুর বিছানার পাশে আমরা দেখতে পাই রতনের মুখের ক্লোজ-আপ। সে বলে — ‘‘বাবু, আমি রতন, তোমার কাজ করি’’ ...এবং.. আশ্চর্য, রতনের সেই মুখও আলোয় আলোকময়। *মণিহারা* বা *চারুলতা*-য়, চরিত্রগুলির মুখই শুধু নয় — আলো হয়ে জেগে থাকে গোটা ঘরের ছোটোখাটো বস্তুগুলি। এ এক আশ্চর্য কার্তেসীয় আলো, যেখানে ডিফিউসড আলোকসম্পাতের গুণে বস্তুসমূহকেই মনে হয় যেন আলোর উৎস। সুব্রত মিত্রর কৃতিত্বকে প্রাপ্য সম্মান জানিয়েও আমাদের মনে হবে — প্রথম পর্বের ছবির এই ব্যাঞ্জনাময় ক্যামেরা-কর্মগুলি জড়িয়ে আছে সত্যজিতের wonder gazing- জাত উদারমানবতাবাদী দর্শনের সঙ্গে।

ইতিহাসের এক প্রবল সন্ধিকালে, সামন্ততন্ত্র ও নব্য-বুর্জোয়া শ্রেণীর দ্বন্দ্ব যখন তাঁর ক্যামেরার উপজীব্য হয়, তখন সামন্তশ্রেণীর পতনের ঐতিহাসিক অনিবার্যতাকে গুরুত্ব দিয়েও সত্যজিৎ *জলসাঘর* ছবিতে আনেন এক ব্যক্তি ট্র্যাজেডির ঘনত্ব। জমিদার বিশ্বম্ভর পেয়ে যান সত্যজিতের করুণার স্পর্শ। মার্ক্সবাদী সমালোচকের দৃষ্টিতে, এ-ছবিকে এককালে প্রগতি পরিপন্থী বলা হলেও, আজ যখন নতুন করে দেখি — সত্যজিতের মানবতার বোধটিকে, বিশ্বম্ভরের ব্যক্তি ট্র্যাজেডির শক্তিমান শিল্পরূপটিকে প্রগতি পরিপন্থী বলে মানতে মন চায়না আমাদের। বিশেষতঃ যখন দেখি ইতিহাসের অনিবার্য প্রগতিকে তিনি অস্বীকার করেন না — প্রতিষ্ঠা দেন এক তির্যক চিত্রভাষায়। একটি লং-শটে আমরা দেখি, দূরে দাঁড়ানো বিশ্বম্ভরের হাতিটিকে ঢেকে দিচ্ছে মহিমের ধাবমান ট্রাকের ধুলো। আর, শেষ দৃশ্যে, দেখি রক্ত বমনরত বিশ্বম্ভরকে। ধূলায় মিশে গেল নাকি, বিশ্বম্ভরের নীল রক্ত? আর, এর পরেই সেই অনবদ্য প্যানিং। ভূলুন্ঠিত বিশ্বম্ভর ও তার পাগড়ি পেরিয়ে ক্যামেরায় ধরা পড়ল বিস্তীর্ণ-বহতা এক

নদী। সময়ের যে অমোঘ গতিকে প্রতিষ্ঠা দেয় এই নির্বাক চিত্রভাষা, সেখানে সত্যজিতের উদার মানবিক দৃষ্টি এক অখণ্ডতার বোধে উত্তীর্ণ হয়। একই ভাবে নদী এসেছে *অপুর সংসার*-এর অন্তিম দৃশ্যে। বস্তুতঃ, অপু ট্রিলজির প্রতিটি ছবি শেষ হয়েছে এক যাত্রা বা অগ্রগমনের প্রতীকে। *চারুলতা* ছবির বহু আলোচিত শেষ দৃশ্যে, ভূপতি ও চারুর বিচ্ছেদের মুহূর্তে— এক স্তম্ভিত ও থমকে যাওয়া সময়ের ধ্রুপদী বিষণ্ণতাকেও সত্যজিৎ উত্তীর্ণ করে দিয়েছিলেন জীবন সম্পর্কিত এক অখণ্ডতার দর্শনে। নেপথ্যে ভেসে এসেছিল অমলের উক্তি — ‘‘যা জীবনের ভাল-মন্দ, জন্ম-মৃত্যু, হাসি-কান্নার সঙ্গে যুক্ত’’ (নেপথ্যের এই সংলাপ, সত্যজিৎ যদিও পরের দিকের সংস্করণে বাদ দিয়ে দেন।) লক্ষণীয় — *চারুলতা* ছবির থিম-সঙ্গীত রচিত হয়েছিল রবীন্দ্রনাথে ‘‘মম চিত্তে নিতি নৃত্যে’’ গানটির সুর ভেঙ্গে, যেখানে আছে এই লাইন ‘‘হাসি কান্না হীরা পান্না দোলে ভালে / কাঁপে ছন্দ, ভাল মন্দ তালে তালে’’। *কাঞ্চনজঙ্ঘা*-র অন্তিমদৃশ্যে, শহুরে মানুষের যাবতীয় ক্ষুদ্রতাকে তুচ্ছ করে দিয়ে শাশ্বত সৌন্দর্য নিয়ে প্রকাশিত হয় স্বর্ণকিরীট কাঞ্চনজঙ্ঘা। সত্যজিতের প্রথম কলকাতাভিত্তিক ছবি *মহানগর*। কিন্তু এ-কলকাতাকে তখনও গ্রাস করেনি সত্তরের অশান্ত জটিলতা। তাই, নাগরিক ছবি হলেও, এ-ছবির শৈলী কৌণিকতা বর্জিত। মসৃণ এক মমত্বের আর বিশ্বাসের আচ্ছাদন জড়িয়ে রেখেছে এ-ছবিরও শরীর। নিও-রিয়ালিজমের সঙ্গে বহিরঙ্গের মিলটুকু পেরিয়ে এ-ছবি দৃষ্টি রাখে স্বাধীনতা-উত্তর কলকাতার মধ্যশ্রেণীর এক কালক্রান্তির উপর। যখন বাড়ির বউ উপার্জনের চাপে পা রাখতে শুরু করেছে বাড়ির বাইরে। সেই বিশেষ সময়ের মধ্যে শ্রেণীর মানসিকতা, অন্দরমহল আর ন্যুয়ান্স-এর একটি ক্রনিকলার হয়ে ওঠে এই ছবি। আগ্রহের সঙ্গে লক্ষ্য করতে হয় যে সত্যজিতের মানবতাবাদী দৃষ্টি কীভাবে নিয়ন্ত্রণ করেছে ক্যামেরার অবস্থান ও দৃশ্যবিন্যাসের ধরনটিকে। *মহানগর*-এর অন্তিম দৃশ্যটি রচিত হয় এই ভাবে —

সহকর্মী এডিথের উপর দুর্ব্যবহারের প্রতিবাদে, রেজিগনেশন জমা দিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসছে আরতি। নীচে অপেক্ষমান সুব্রতকে দেখে সে বলে —

আরতি। আমি চাকরি ছেড়ে দিয়েছি।

সুব্রত। তুমি যা পেরেছ, আমি হয়তো তা পারতামই না। রোজগারের তাগিদে আমরা ভিতু হয়ে গেছি, আরতি। ... কেঁদোনা। এখন শক্ত হবার সময়।

আরতি। এত বড় শহর, এত রকমের চাকরী ... দুজনের এক জনও কি পাব না একটা?

সুব্রত। চেষ্টা তো করে দেখি —

লক্ষণীয়, এখানে ক্যামেরার অবস্থানটি। সুব্রত ও আরতির সংলাপের সময়, ক্যামেরা নীচে নেমে এসেছে, প্রায় মাটির কাছাকাছি। সেখান থেকে, ক্যামেরা একটি লো অ্যাঙ্গল শটে যেন নীচু থেকে উপরে তাকিয়ে ধরেছে সুব্রত আর আরতিকে। মিড ক্লোজ-আপ-এ এই দৃশ্যে যেহেতু সুব্রত আর আরতি ছাড়া কেউ নেই, নীচু থেকে ধরা এই ক্যামেরা দৃষ্টিতে দৃশ্যগত ভাবে সুব্রত আর আরতির শরীরে আরোপিত হচ্ছে এক ধরনের মহনীয়তা। অর্থাৎ, আত্মশক্তির প্রকাশে, এই চরিত্রদুটি যেন হঠাৎ তাদের স্বাভাবিক মাপ ছাপিয়ে অনেকটা বড় হয়ে উঠল। ১৯৬৩ সালে নির্মিত এই ছবিতে যেন উঁকি দিয়ে গেল ১৯৬১ সালের *কাঞ্চনজঙ্ঘা*-র অশোক। অশোক প্রত্যাখ্যান করেছিল দাম্ভিক ইন্দ্রনাথের দেওয়া চাকরির প্রস্তাব। লক্ষ্যণীয়, দুটি ছবিতেই প্রতিবাদ উঠে এসেছে এক মানবিক মূল্যবোধ আর আত্মসম্মানবোধের জায়গা থেকে। শ্রেণীচেতনা থেকে নয়। আর, প্রতিবাদের এই বিকাশ-মুহূর্তে বেজে ওঠে যেন এক রোমান্টিসিজমেরও সুর। এরপর আসে একটি ক্রেন শট। সুব্রত আর আরতি হাঁটতে থাকে ক্যামেরার দিকে পিছন ফিরে। সেই মুহূর্তে হঠাৎ আকাশবিহারী হয়ে ওঠে ক্যামেরা। ফোরগ্রাউন্ডে ধরা থাকে কলকাতার বিশিষ্টতা নিয়ে, মিউনিসিপ্যালিটির একটি ল্যাম্পপোস্ট। আর নীচে জনারণ্যে মিশে যায় — আরও অনেকের মত একজন আরতি আর একজন সুব্রত। এক অখণ্ড আশাবাদী সুরে *মহানগর* ছবির সমাপ্তি আসে।

সত্যজিতের প্রথম পর্বে নির্মিত কলকাতাভিত্তিক ছবি *মহানগর*-এর পাশে যদি রাখা যায়, সত্তরের দশকের কলকাতাভিত্তিক তিনটি প্রধান ছবিকে (*প্রতিদ্বন্দ্বী, সীমাবদ্ধ* ও *জন অরণ্য*) দেখা যাবে — এই পর্যায়ে, তাঁর জগৎ-দৃষ্টিতে ঘটে যাচ্ছিল এক গুণগত পরিবর্তন। বোঝা যাচ্ছিল সমকালের জটিলতা দীর্ঘ ছায়া ফেলছে তাঁর মানসজগতে। এক বিবেকী তাড়নায় তিনি তাকাতে চাইছেন তাঁর সমকালে। তাকাতে চাইছেন হয়ত, তাঁর আশৈশব লালিত মানবিক দৃষ্টি দিয়েই। তিনি দেখছিলেন পৃথিবী আর আগের মত নেই। মধ্য-ষাট থেকে বইতে শুরু করেছে পরিবর্তনের হাওয়া। একটু চোখ রাখা যাক সেই সময়ের রাজনৈতিক ঘটনাবলীর দিকে। ১৯৬৬ সালে খাদ্য আন্দোলন। ওই সময়ে বন্দীমুক্তির দাবীতে যে মৌনমিছিল, তাতে অংশগ্রহণ করতে হয়েছিল সত্যজিতকে। ভিয়েতনাম যুদ্ধের সময় বন্ধুদের অনুরোধে (যারা সকলেই ছিলেন মার্ক্সবাদী) তাঁকে একটি সমাবেশে, একটি 'আন্তর্জাতিক আবেদন' পাঠ করতে হয়। ১৯৬৭-তে নকশালবাড়ি আন্দোলনের সূত্রপাত। ওই বছরেই ২ মার্চ, প্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকারের পত্তন ও তার কিছু পরেই পতন। ১৯৬৯-এ দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট গঠন। ওই বছরেই ১ মে, শহীদমিনারের তলায় নকশালবাদীদের প্রকাশ্য জনসভা। পাশাপাশি চলছে জমি দখল ও ধান লুটের ঘটনা। এর কিছু পরেই পুলিশবাহিনী ও নকশালবাদীদের প্রত্যক্ষ সংগ্রামে কলকাতা অগ্নিগর্ভ হয়ে ওঠে। ১৯৬৭-তে সত্যজিত মারী সিটন কে লিখছেন —

> The political situation is getting so rough here, that I'm beginning to worry about any Calcutta project.

১৯৭০-এ ঋত্বিক ঘটক পরিচালিত *আমার লেনিন* ছবিটির মুক্তির দাবীতে সুশীল করণ-কে চিঠি লিখলেন সত্যজিত। ১৯৭১-এ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ শুরু হল। এ-প্রসঙ্গে, মারী সিটন-কে সত্যজিত লিখলেন —

> Incredible brutality and barbarism on the part of West Pakistan soldiers & incredible feats of heroism by the poorly armed Bengalis. I am dumbfounded by the apparent apathy of outside world & even of the Afro-Asian nations. China has openly supported West Pakistan, which for me, makes them most inhuman & coldly calculating power in the world!

এই ভাবেই, দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, উত্তাল সমকাল ক্রমশই টলিয়ে দিতে চাইছে সত্যজিতের ধ্যানী শিল্পের জগৎ — তাঁর রেনেসাঁ অর্জিত শোভনসুন্দর মানসভূমি। 'ব্যক্তি' সত্যজিতের অতীতচারী মন, তাকাতে শুরু করলো সমকালের বিপুল 'ব্যষ্টি' ঘটনাবলীর দিকে। তিনি বুঝতে চাইলেন সমকালকে, তাঁর এ-যাবৎ লালিত উজ্জ্বল উদার মানবিক দৃষ্টি দিয়েই। কিন্তু এখানে এসে, এক দ্বন্দ্বের সম্মুখীন হল কি তাঁর মন? কারণ, বহুস্তরিক এবং জটিল রাজনীতি ও অর্থনীতি হল সমকালের মূল চালিকাশক্তি। সেই রাজনৈতিক দৃষ্টিবর্জিত বিশুদ্ধ মানবতাবাদ দিয়ে কি ধরা যাবে সমকালের হৃদ্‌স্পন্দন? এই যে সমকালের দিকে ফিরে তাকানোর এক বিবেকী তাড়না ও দায়িত্ববোধ, সমকালের জমিতে নিজের শিকড়টুকু খুঁজে ফেরার নিরন্তর প্রয়াস এবং খুঁজে না পাওয়ার যে দ্বিধা-দীর্ণ মানসিক যন্ত্রণা, তারই এক অনবদ্য শিল্পরূপ হিসেবে *প্রতিদ্বন্দ্বী* ছবিটি আমাদের কাছে প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে। এ ছবির নায়ক সিদ্ধার্থ যেন অনেকদূর পর্যন্ত সত্যজিতের মানসিকতারই প্রতিফলন। তাই, এ ছবিতে তিনি সহজ 'আইডেন্টিফিকেশন' খুঁজে পান সিদ্ধার্থর সঙ্গে, তার নকশালপন্থী ভাই টুনুর সঙ্গে নয়। ১৯৭০ সালে নির্মিত এই ছবি তাই আমাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে অনেকগুলো কারণে। এ ছবি, সত্যজিতের সমকালীন কলকাতানির্ভর ছবিত্রয়ের (কলকাতা ট্রিলজি) প্রথম ছবি। আর, এই ছবি দাঁড়িয়ে আছে সত্যজিতের দীর্ঘ চলচ্চিত্রজীবনের প্রথম পর্বের ক্রান্তিকালে (*অরণ্যের*

দিনরাত্রি-র পরের ছবি হিসেবে)। বাংলার ইতিহাসের এক রাজনীতি উত্তাল সময়ে, এই শতাব্দীর এক শক্তিশালী ও সংবেদনশীল শিল্পীর দ্বিধা-দীর্ণ মানসিকতার দলিল হিসেবে, এই ছবিটি আমাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে থাকে। আজ বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করতে হয়, সত্যজিৎ মানসের দ্বৈততা, দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, সমকালের জীবনপ্রবাহের সঙ্গে তাঁর মানসিক দূরায়ণ বা 'অ্যালিয়েনেশন', মানসিক প্রতিসরণ এখানে কীভাবে সঞ্চারিত হয়েছে *প্রতিদ্বন্দ্বী* ছবির চিত্রভাষায়, আঙ্গিকে। এ ছবির এডিটিং প্যাটার্নে শট-বিন্যাসে, পর্ব থেকে পর্বান্তরে, স্বপ্ন থেকে বাস্তবে যাওয়া-আসার ভঙ্গীতে বা পাশাপাশি ব্যবহৃত ফ্ল্যাশব্যাক ও ফ্ল্যাশ ফরোয়ার্ডের ব্যবহারে মধ্য দিয়ে এই ছবির শরীরে তৈরি হয় এক অশান্ত দোলা। চিত্রভাষার এই রীতি সত্যজিৎ তাঁর অন্য কোনও ছবিতে ব্যবহার করেননি। এই ছবি থেকে শুরু করে পরের কলকাতাভিত্তিক দুটি ছবিতে (*সীমাবদ্ধ* এবং *জন অরণ্য*) আমরা লক্ষ্য করব তাঁর স্বভাবসিদ্ধ উষ্ণতা বা প্রধান চরিত্রগুলিতে তাঁর 'পার্সোনাল টাচ', ক্রমশঃই অন্তর্হিত। তার জায়গা নিয়েছে একটা কোল্ড আর ক্লিনিকাল ভঙ্গী। ... ট্রিটমেন্টের দিক থেকে, এই ছবি গুলিতে এসেছে এক ধরনের কৌণিকতা। প্রায়শঃই খসে খসে পড়ছে চিত্রভাষার নিঃশব্দ ব্যঞ্জনার বহুস্তরিক বিস্তার। পরিবর্তে এসেছে তাঁর 'ইনটেলেক্ট'-বাহিত তীক্ষ্ণ ও ধারাল সংলাপ। হৃদয় বা অবচেতনার বোধ ক্রমশঃ জায়গা ছেড়ে দিচ্ছে সচেতন বুদ্ধিকে। ডিজল্ভ, ফেড-ইন, ফেড-আউট-এর জায়গায় বেশি-বেশি করে আসছে কাট শট। *সীমাবদ্ধ* ছবিতে মাত্র চারটি ডিজল্ভ ব্যবহার করা হয়েছে। আর, গুরুত্বপূর্ণ হল — এই ছবিগুলিতে ক্রমশই তাঁর একদা 'সিগনেচার' বাহিত সঙ্গীতের স্থান নিচ্ছে নাগরিক শব্দ-অনুষঙ্গ। উল্লেক্ষ্য যে — প্রিয়তা বা মনোযোগের বিচারে, সত্যজিতের চেতনায় সঙ্গীতের স্থান ছিল চলচ্চিত্রের থেকেও প্রাচীন। সত্যজিৎ, তাঁর সমকালের পাঠে সঙ্গীতের কোনও সংযোগ আর খুঁজে পাচ্ছিলেন না যেন। চারুলতা বা মণিমালিকার নিঃসঙ্গতাকে চিহ্নিত

করেছিল সত্যজিতের অনুপম সঙ্গীত। প্রতিতুলনায়, আমাদের মনে পড়ে যাবে *প্রতিদ্বন্দ্বী* ছবির সেই বিশেষ দৃশ্যটি, যেখানে একটি পতিতালয় থেকে প্রায় পালিয়ে আসে সিদ্ধার্থ। একাকী হাঁটতে থাকে রাস্তায়। সেই সময়ে, তার নিঃসঙ্গতাকে বিশেষ মাত্রা দেয় কোনো সঙ্গীতাংশ নয় — হঠাৎ ভেসে আসা আর মিলিয়ে যাওয়া একটি নির্জন স্কুটারের শব্দ। একই ভাবে, *সীমাবদ্ধ* ছবির টাইটেল শটে এসেছে টাইপরাইটার আর টেলিফোনের শব্দ। লক্ষণীয় যে — *প্রতিদ্বন্দ্বী*, *সীমাবদ্ধ* আর *জন অরণ্য*, তিনটি ছবিতেই বড় হয়ে ওঠে একটা বিষন্নতার সুর। তবু — এই বিষন্নতা সত্ত্বেও, *প্রতিদ্বন্দ্বী* ছবিতে সিদ্ধার্থ যেহেতু সত্যজিতের মানসজগতেরই সম্প্রসারণ — এ ছবির শেষদৃশ্যে আমরা আবার পেয়ে যাই তাঁর উদার মানবিক দৃষ্টির ম্যাজিক, তাঁর অখণ্ডতার দর্শন। এখানে — ফোরগ্রাউণ্ডে, দাঁড়িয়ে থাকে সিদ্ধার্থ। অনেক দূরে — নীচে, ফ্রেমের বাঁ দিক দিয়ে শববাহকের একটি দল ঢোকে। তাদের ভারী গলার ‘‘রাম নাম সত্য হ্যায়’’ ধ্বনিতে জেগে ওঠে বিষণ্ণতা। এর পরেই — নেপথ্যে, শৈশবের নস্টালজিয়া নিয়ে আছড়ে পড়ে সেই পাখির আশ্চর্য ডাক। জেগে ওঠে, জীবনের আনন্দ-বিষাদ, জীবন-মৃত্যুর এক অখণ্ডতার বোধ। আবারও প্রকাশিত হয়, সত্যজিতের সংলাপহীন চিত্রভাষার অনুপম অ্যাম্বিভ্যালেন্স।

কিন্তু, *সীমাবদ্ধ* থেকে *জন অরণ্য* সত্যজিৎ ক্রমশঃ আরও শীতল থেকে শীতলতর হয়ে যান। *কাঞ্চনজঙ্ঘা*-র অশোক, *মহানগর*-এর আরতি চাকরি প্রত্যাখান করেছিল। *সীমাবদ্ধ*-র শ্যামলেন্দু পিটার্স কোম্পানির ডিরেক্টর হয়। *জন অরণ্য*-র সোমনাথ তার বহু আকাঙ্ক্ষিত অর্ডার সাপ্লাইয়ের কন্ট্রাক্ট পেয়ে গেছিল। সহজ হয়নি সেই অর্জন। পরিবর্তে, তাদের ছাড়তে হয়েছিল এক সার্বিক মূল্যবোধ। মধ্যবিত্তশ্রেণীর এই দুই প্রতিভূ চরিত্রে আমরা লক্ষ্য করি এক অন্তস্থিত ‘ভিলেইনি’ – যা পেরিজ খুঁজে পাননি প্রথম পর্বের সত্যজিতে। এক আত্মিক

বিসর্জনের চিত্ররূপে দুটি ছবির শেষেই আসে সিঁড়ির প্রতীকী ব্যঞ্জনা। আর আসে দীর্ঘ ছায়া। লক্ষণীয়, এই দৃশ্যেও আছে কার্তেসীয় আলো। কিন্তু এই আলো, আলোকে প্রকাশ করছে না আর। প্রকাশ করছে এক সর্বব্যাপী ছায়াকে। এ বড় দুঃসময় — যখন, মানুষের থেকে বড় হয়ে ওঠে তার ছায়া। *মহানগর*-এর ক্রেন শট, আরতি আর সুব্রতকে পৌঁছে দিতে চেয়েছিল — বৃহৎ জনারণ্যে, আশাময় ভবিষ্যতে। *সীমাবদ্ধ* ছবির অন্তিম ক্রেন শট শ্যামলেন্দুকে ফেলে রাখে প্রত্যাখানে, পরাভবে, ধ্বস্ততায়, নিঃসীম নির্জনতার মাঝখানে। বৈচিত্রহীন যান্ত্রিকতা নিয়ে শুধু অবিরাম ঘুরে যায় পিটার্স পাখা।

জন অরণ্য ছবির অন্তিম দৃশ্যটি শুরু হয় দ্বৈপায়ন — অর্থাৎ, সোমনাথের বাবার পর্দা-জোড়া অন্ধকারাচ্ছন্ন মুখচ্ছবি দিয়ে। সোমনাথ, বাবাকে তার অর্ডার সাপ্লাইয়ের কন্ট্রাক্টটি পাওয়ার খবর জানায়। দ্বৈপায়নের মুখের স্বস্তিময় হাসি দিয়ে ছবিতে পরিসমাপ্তি আসে। দ্বৈপায়ন জানতে পারেন না তাঁর পুত্রের 'সাকসেস'-এর ইতিহাসটুকু। যা, অর্জন করতে গিয়ে সোমনাথ একটু আগে তার প্রিয় বন্ধুর বোনকে ফেলে রেখে এসেছে, ক্লায়েন্টের সুখশয্যায়। উল্লেখ থাক — এখানে সত্যজিৎ মূল উপন্যাস থেকে একটি বড় পরিবর্তন ঘটিয়েছিলেন। মূল উপন্যাসে সোমনাথ জানতে পারেনি যে, ওই রমণী তার বন্ধু সুকুমারের বোন। সত্যজিৎ তাঁর সোমনাথকে এই আপাত অজ্ঞানতার আড়াল ও স্বস্তিটুকু দিতে চাননি। যে মানবতার মূল্যবোধে সত্যজিতের আশৈশব লালন, দ্বৈপায়ণ এ ছবিতে সেই মানবতারই বাহক ও প্রতিভূ। মানবতার এই 'ইনোসেন্স'এর মূলে এক ঠাণ্ডা আর তীব্র 'আয়রনি'র কশাঘাত করতে হল তাঁকে। কশাঘাত করলেন কি নিজের অবস্থানকেই? সমকালের মধ্যে নিজের অবস্থানগত দূরায়ণের এই যন্ত্রণাময় উপলব্ধিতে পৌঁছতে সত্যজিতকে পেরিয়ে আসতে হল দীর্ঘ পথ। ১৯৫৫ থেকে ১৯৭৫ এ। *পথের পাঁচালী* থেকে *জন অরণ্য*-এ।

সমকালের আর্থসামাজিক জটিলতার মধ্যে, বা সমকালীন জীবনচিহ্নের মধ্যে, শেষ পর্যন্ত তাঁর মনের শিকড় সত্যজিৎ খুঁজে নিতে পেরেছিলেন কি? এ বিষয়ে আমাদের কাছে উল্লেখযোগ্য নির্দেশক হয়ে ওঠে *আগন্তুক* ছবিটি। *আগন্তুক*-এর মনমোহন এ-ছবিতে সরাসরি সত্যজিতের মানসপ্রতিভূ। এ-কথা সত্যজিৎ নিজেই বলেছেন বহুবার। তাই, রেনেসাঁ পর্বের মানসচিহ্নগুলি আমরা মনমোহনের মধ্যেও খুঁজে পাই। কিন্তু, এ-ছবিতে মনমোহন শেষ পর্যন্ত একজন দূরের বা বহিরাগত হিসেবেই থেকে যান। বাইরে থেকে কলকাতার মধ্যবিত্তর সমকালীন জীবনে এসে, তিনি কিছু দিন কাটিয়ে যান ... শরিক হতে পারেন না শেষপর্যন্ত। তাঁর এই স্বল্পকালীন অবস্থানের মধ্যে দিয়ে ছবিতে একটি 'ডিসকোর্স' তৈরি হয়। মনমোহন ও সমকালীন মানসিকতার মধ্যে একটি দ্বন্দ্বময় সংলাপ হয়ে ওঠে এই ছবি। মনমোহনের জীবন ও দর্শনের মধ্য দিয়ে আমরা ক্রমশ যে 'ট্রাইবাল' বা 'অ্যাবঅরিজিনালস'-এর প্রসঙ্গটি মূর্ত হয়ে উঠতে দেখি, তার যৌক্তিকতার থেকেও বড় হয়ে ওঠে একটি আর্তি। সেই আর্তি ডাক দেয় যেন আরও এক আরম্ভের জন্য। আবার শুরুতে ফেরার ডাক। তাই শান্তিনিকেতনে গিয়ে — রবীন্দ্রনাথ নয়, তিনি আশ্রয় ও শান্তি খোঁজেন সাঁওতালদের মধ্যে। শেষদিকে, মনমোহন তাঁর একটি অসমাপ্ত লেখার কথাও বলেন, যেটির নাম — "An Indian Amongst Indians"। নামের এই দ্ব্যর্থকতার মধ্যে একটি 'অ্যালিয়েনেশন'-এর ছোঁয়া লেগে থাকে না কি?

যে রবীন্দ্রনাথের মানববাদী দৃষ্টির উজ্জ্বল উত্তরাধিকার বহন করছিলেন সত্যজিৎ, তাঁরই গানের একটি উচ্চারণের মধ্যে যেন মূর্ত হয়ে আছে সত্যজিতের মানস ও সমকালীন পৃথিবীর মধ্যেকার দ্বন্দ্ব-যন্ত্রণাটুকুর সারাৎসার —

"আমার নিখিল ভুবন হারালেম আমি যে —
বিশ্ববীণায় রাগিণী যায় থামি যে"

সূত্র
1. *The Portrait Of A Director*: Marie Seaton
2. *Satyajit Ray-The Inner Eye*: Andrew Robinson
3. *Our Films, Their Films*: Satyajit Ray
4. *IFSON*-Special Ray Number. August, 1992
5. *চিত্রভাষ*। জুন, ১৯৯২।
6. *এক্ষণ*। ১৯৯৩ (আগন্তুক ছবির চিত্রনাট্য)